শাপলা ডাটার উপকারিতা

নতুন প্রজন্মের কাছে শাপলার ডাটার উপকারিতা এবং তার ব্যবহারের পদ্ধতি জানা অত্যন্ত জরুরি।শাপলার ডাটা, বাংলাদেশের রান্নার অন্যতম বৈচিত্র্যময় উপাদান। এটি একটি পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু খাদ্য উপাদান যা শাপলা ফুলের পাতা এবং কন্দ থেকে তৈরি হয়, যা সাধারণত স্যুপ, চচ্চড়ি বা সালাদে ব্যবহৃত হয়।

শাপলার ডাটার পুষ্টিগুণ বেশ চমকপ্রদ। এতে রয়েছে ভিটামিন এ, সি ও ই যা ত্বক ও চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এতে আরো রয়েছে খনিজ পদার্থ যেমন ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়াম। ক্যালসিয়াম হাড়ের ঘনত্ব বাড়ায় এবং ভাঙা হাড়ের সেরে ওঠা দ্রুত করে। আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়িয়ে রক্তস্বল্পতার সমস্যা দূর করে, আর ম্যাগনেসিয়াম শরীরের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন মাংসপেশি সংকোচন ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রমে সহায়তা করে।

এছাড়া শাপলার ডাটা ফাইবারে সমৃদ্ধ, যা পাচনতন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়ক। এটি স্বাভাবিক রক্তচাপ বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং হজম ক্ষমতা উন্নত করে। বিভিন্ন ধরনের চর্বি ও প্রোটিনের সাথে মিলিয়ে রান্না করলে এটি একটি পুষ্টিকর খাবারে পরিণত হয়।

অতএব, শাপলার ডাটা খাওয়ার মাধ্যমে আপনি শুধু সুস্বাদু খাবারই উপভোগ করবেন না, বরং আপনার শরীরকে স্বাস্থ্যকর রাখতেও সাহায্য করবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

গামছায় নান্দনিক সাজ

দেশীয় ফ্যাশন হাউসে একবার গিয়ে দেখুন। গামছার শাড়ি, কুর্তি, ব্লাউজ আর কটি এখন বাড়তে শুরু করেছে। গামছা দিয়ে বানানো ব্যাগ, টুপি, হেডব্যান্ড এমনকি পার্সও এখন দেদারসে ব্যবহৃত হচ্ছে।

গামছার মতো জিনিস কিভাবে ফ্যাশন অনুষঙ্গ হলো তা বোঝা জরুরি। পরতে আরামদায়ক ও টেকসই বলে গামছার কাপড় সব সময়ই সমাদৃত হয়ে আসছে। আর এই আরামদায়ক পোশাক গরমের সময় অনেক আরামদায়ক, বর্ণিল ও রঙিন হওয়ায় অনেক কাজে আসে।

শাড়ি ব্লাউজ কুর্তিতে
গোসলখানা থেকে গামছা ফ্যাশনে আসে শাড়ি হয়ে। বৈশাখ, ফাল্গুন, গায়েহলুদের মতো অনুষ্ঠানের জন্য একসময় অনেকে বেছে নিয়েছিলেন গামছা প্রিন্টের শাড়ি।সময় বদলে গেছে। এখন সুতির পাশাপাশি সিল্ক, হাফসিল্ক শাড়িতেও গামছা চেক দেখা যায়। তবে তাঁতের শাড়ির মধ্যে গামছা চেক দেখা যায় বেশি। শুধু যে বাঙালি উৎসবে গামছা শাড়ি পরিধান করা হয়, তা কিন্তু নয়। অনেকে ফরমাল অনুষ্ঠানেও এসব গামছার পোশাক পরছেন। অনেকে সাধারণ তাঁতের শাড়ির সঙ্গে গামছা প্রিন্টের ব্লাউজ ব্যবহার করছেন। সে ক্ষেত্রে গামছা ব্লাউজ ঘটি হাতা কিংবা বোট গলা দিয়ে বানানো যেতে পারে। কিংবা গলা দিয়ে কোমর পর্যন্ত ব্লাউজ বানিয়ে ভাঁজ করে শাড়ি পরলে আলাদা একটা লুক পাওয়া যায়। কিছু শাড়ির পাড়ে গামছার প্যাচওয়ার্কও করা হচ্ছে।গামছার কুর্তিও রয়েছে। এগুলো অফিস, ক্লাস কিংবা প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য বেশ আরামদায়ক।

কটি, কাফতান, টপস, ফতুয়া ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে গামছার ব্যবহার দেখা যাচ্ছে এখন। গামছা দিয়ে বানানো পোশাক জাঁকজমকপূর্ণ করা হয় না বটে; কিন্তু এর সঙ্গে মানানসই অনুষঙ্গ ব্যবহারে দিতে পারে একেবারে ভিন্ন লুক। ভিন্নতা আনার জন্য কড়ি কিংবা কাঠ-পুঁতির ব্যবহার করা যায় এতে। অনেক গামছা পোশাকে কিছুটা হাতে করা সুতার কাজ দেখা যায়। বাজারের প্রচলিত গামছা দিয়ে পোশাক বা অন্যান্য অনুষঙ্গ তৈরি হয় না। সে জন্য বিশেষ গামছা তৈরি করা হয়, যাতে পাকা রঙের ব্যবহার থাকে। ফলে পোশাক থেকে সহজে রং বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার চিন্তা থাকে না।

গয়না ও অন্যান্য
গামছা দিয়ে যে শুধু পোশাক তৈরি হচ্ছে, তা নয়। গামছার কাপড় দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে হাতে তৈরি গয়না। অনেক গয়না প্রেমী বৈচিত্র্য ও ভিন্নধর্মী গয়নার খোঁজে থাকেন। তাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে গামছা দিয়ে তৈরি গয়না। এ ছাড়া অনেকে নিজের ঘর নান্দনিকতা ও দেশীয় ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় সাজিয়ে রাখতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যও পাওয়া যাচ্ছে গামছা প্রিন্টের চাদর, কুশন, পর্দা, ডাইনিং রানার ইত্যাদি।

পশ্চিমি পোশাকে গামছা
টপস, স্কার্ট, গাউন, কটি ইত্যাদি পোশাক তৈরিতে এখন গামছার ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। ছেলেদের জন্যও তৈরি করা হচ্ছে শার্ট, পাঞ্জাবি, ফতুয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া রয়েছে গামছার ব্লেজার ও কটি। কটিগুলো সাধারণত এক রঙের পাঞ্জাবির ওপর পরা হয়। তবে গামছা নিয়ে কাজ করার সময় অনেক সময় ফ্যাশন হাউজকে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ মানুষের কাছে সবসময় নতুন ট্রেন্ডের ওপর আস্থা তৈরি করা কঠিন। তাও এখন আস্তে আস্তে এর গুরুত্ব বাড়ছে।

দাম কেমন হয়?
গামছা পোশাকের দাম নির্ভর করে ডিজাইন ও ফ্যাশন হাউসের ওপর। পণ্য ও ধরন-ভেদে ১ হাজার ৫০০ থেকে ৬ হাজার টাকার মধ্যে এ পোশাক পাওয়া যায়। এখন অনলাইন ও অফলাইন অনেক ভেন্ডর ফিউশনধর্মী পোশাক করছেন। সেখানে রয়েছে গামছার ব্যবহারও।

সূত্র: ইত্তেফাক

কোন মুখে কেমন চশমা

চশমার ফ্রেম বাছাই করতে বিপাকে পড়েননি এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। এত এত চশমার ফ্রেমের মধ্যে নিজের জন্য পারফেক্ট ফ্রেম সিলেক্ট করা আমাদের কাছে যেন একটি চ্যালেঞ্জ। তাই ফ্রেম বাছাইয়ে মুখের শেপের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্টাইল এবং স্বাচ্ছন্দ্যকেও বিবেচনা করা উচিত।

লম্বা চেহারা
এ চেহারায় অ্যাভিয়েটর ফ্রেমের চশমা বেশি মানানসই। এতে চেহারায় লম্বাটে ভাব কমে আসবে। কিছুটা চওড়াও লাগবে।

ডায়মন্ডকাট ফেস
ডায়মন্ড আকৃতির চেহারায় চোখের পাশে ও চোয়ালের কাছে সংকীর্ণ হয়। এই চেহারায় গাল হয় চওড়া। এ রকম চেহারায় চোখগুলো তুলে ধরাই চশমা পরার মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে চশমার ওপরের দিকে নকশা থাকলে দেখতে ভালো লাগবে। ওভাল অথবা ক্যাট আই আকারের চশমাও মানাবে।

স্কয়ার ফেস
চারকোনা চেহারায় কপাল ও চোয়াল চওড়া হয়। প্রস্থে কম এমন ওভাল ও গোল ফ্রেমের চশমা বেছে নেওয়া উচিত এক্ষেত্রে। ভুল করে যদি চারকোনা ফ্রেমের চশমা বেছে নেন, তাহলেই হিতে বিপরীত হয়ে যাবে।

চশমা
হার্ট শেপ বা ট্রায়াঙ্গাল ফেস
অনেকে বলে পান পাতার মত চেহারা। এই চেহারার প্রশস্ত কপাল ও চওড়া চিকবোন থুতনির কাছে গিয়ে চাপা হয়ে যায়। চশমা বাছার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখুন, ফ্রেমের নিচের অংশটি যেন চওড়া হয়। কিন্তু চশমাটির রং ও উপকরণ যেন হালকা হয়।

রাউন্ড ফেস
প্রশস্ত কপাল, ভরাট গাল গোলাকার চেহারার জন্য আয়তাকার ফ্রেমের চশমা প্রয়োজন। এতে চেহারায় কিছুটা শুকনো ও লম্বাটে ভাব চলে আসবে।

ওভাল ফেস
এই আকারের চেহারার মানুষদের মুখ হয় ডিম্বাকার । কারণ, এ ধরনের চেহারায় প্রায় সব ফ্রেমের চশমাই মানিয়ে যায়। চওড়া আকারের ফ্রেমের পাশাপাশি বড় সাইজের চশমাও পড়তে পারেন।

ছোট ও বড় ফেসের জন্য
চেহারা যদি ছোট হয় তাহলে সরু এবং ছোট ফ্রেমের রাউন্ডেড চশমা পরবেন।আর বড় আকৃতির চেহারায় মোটা ফ্রেমের ওভার-সাইজের চশমা পরবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

নিজে সেরা ভার্সন হবেন যেভাবে

নিজের সেরাটাই সবাই দেখাতে চায়। নিজস্ব সত্তা আর ব্যক্তিত্বই আসলে সব। তবে অনেকের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে। তারা পড়েন বিপাকে। নিজের সেরাটা কিভাবে ইমেজ ডেভেলপমেন্টে কাজে লাগাবেন তা

একবার দেখে নেওয়া জরুরি।

ইমেজ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কিছু কথা
ভাবমূর্তি উন্নয়ন এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একজন মানুষের ভেতর থেকে তার সেরাটুকু বের করে আনা হয়। অর্থাৎ ‘ইমেজ ডেভেলপমেন্ট’ প্রশিক্ষকের কাজ হলো একজন বা একদল মানুষের ভেতর থেকে তার সবচেয়ে ভালো বিষয়গুলো বের করে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া, তার ব্যক্তিগত বা পেশাজীবনকে সহজ বা সুন্দর করতে সাহায্য করা। কীভাবে একজন মানুষ অন্যদের সামনে নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করবেন, কীভাবে তার ব্যক্তিত্বের গঠন সুন্দর হবে, কোন উপায়ে তিনি নিজের পেশা ও ব্যক্তিজীবনের মধ্যে সমন্বয় করবেন, তার সবই শেখানো হয় এই প্রশিক্ষণে।

ভার্সন
এই বিষয়ে একজন মানুষের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সবকিছু শেখানো হয়। নিজেকে আরও উন্নত করা, সুন্দরভাবে কথা বলা, দক্ষতার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করা, মানুষের সঙ্গে মেশা, ভালো প্রেজেন্টেশন দেওয়া, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চলা, যোগাযোগ দক্ষতা—সব শেখানো হয়। মোটকথা, ভাবমূর্তি উন্নয়ন আপনাকে আপনার সবচেয়ে ভালো সংস্করণটি হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

কেন জরুরি?
ইমেজ ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ নিলে একজন মানুষ তার চলাফেরা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ—সবকিছু নিয়ে অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। প্রত্যেক মানুষ যেন নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী হন, পেশাজীবন অনুযায়ী নিজে গড়ে তুলতে পারেন, সহকর্মীদের সঙ্গে, পরিচিতদের সঙ্গে সঠিক আচরণ করতে পারেন, সেই আত্মবিশ্বাসই তাকে দেওয়া হয়।

শিশুদের জন্যও ব্যবস্থা আছে
শিশুদের জন্যও এখন এ ধরনের আলাদা কোর্স ব্যবস্থা আছে। মানুষের ভেতর-বাহির দুদিকের উন্নতির কথা মাথায় রেখেই তার ইমেজ ডেভেলপমেন্ট কোর্স সাজিয়েছেন যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষক পদ্মশ্রী। যোগব্যায়াম, লাইফ গ্রুমিং, রাগ নিয়ন্ত্রণ, সময় ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব, কর্মক্ষেত্রে নীতিগত সততা, দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর সঙ্গে ব্যবহার, অনেক মানুষের মধ্যে কথা বলার ধরন ইত্যাদি শেখানো হয় এসব কোর্সে। এ ছাড়া শিশুদের জন্য বিশেষায়িত কোর্সটিতে শেখানো হয় শ্রেণিকক্ষের সাধারণ ভদ্রতা, খাবার টেবিলের আচরণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মুঠোফোনে

আসক্তি থেকে দূরে থাকার কৌশল, নীতিগত উন্নয়ন ইত্যাদি।

সূত্র: ইত্তেফাক

ঘর থেকেই হোক ‘গুড টাচ-ব্যাড টাচ’র শিক্ষা

শিশুদের আদর করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। একটি শিশুর জন্মের পর থেকে তার মা-বাবাসহ তার পরিমণ্ডলের সবাই স্নেহের স্পর্শে রাখে। তারা সবাই স্নেহের চাদরে শিশুটিকে আগলে আগলে বড় করে তুলতে চায়।

তবে একথাও সত্য যে স্পর্শ কখনো কখনো শুধুই স্পর্শ নয়। অনেক সময় সেই স্পর্শেও থাকে বিকৃতি কিংবা দুরভিসন্ধি। তাই তো শিশুদের ছোটবেলা থেকেই কোন স্পর্শ ভালো কোন স্পর্শ খারাপ (গুড টাচ-ব্যাড টাচ) তা বোঝা জরুরি।

হবু মায়ের পোশাকহবু মায়ের পোশাক
প্রতিটা কোমলমতি শিশুর অধিকার নিরাপদে হেসে-খেলে বেড়ে ওঠা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি, যৌন নির্যাতন কিংবা যৌন হয়রানির মত ঘটনার শিকার অনেক শিশুর ক্ষেত্রে হয়। আর এটি যে কেবল কন্যা-শিশুর ক্ষেত্রে ঘটতে পারে, তা কিন্তু নয়। ছেলে শিশুটিও নিরাপদ নয় এমন বিকৃত অভিজ্ঞতা থেকে।

ভয় এবং শঙ্কার বিষয় হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুরা এ ধরনের হয়রানির শিকার হন ‘কাছের মানুষ’ বা পরিচিত কারও দ্বারা। অথচ শিশুরা বিষয়টি বুঝতেও পারে না যে তাদের সঙ্গে কী ঘটছে। আর সে যখন বুঝতে শেখে তখন এ ধরনের ঘটনা তার উপর অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করে। তাই শিশুকে অবশ্যই গুড টাচ ও ব্যাড টাচের পার্থক্য শেখাতে হবে। এ সম্পর্কে ধারণা থাকলেই শিশু নিজে থেকে সতর্ক হতে পারবে।

শিশুদের গুড টাচ ব্যাড টাচ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার নাসরিন জাহান।

তিনি বলেন, শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন বর্তমান সমাজে যেন ব্যাধির আকার নিয়েছে। প্রায়ই শিরোনামে চলে আসে এ ধরনের ঘটনা। শুধুমাত্র কন্যা সন্তান নয়। পুত্রসন্তানও হতে পারে নির্যাতনের শিকার। অবশ্যই মানসিকতার বদল প্রয়োজন। একই সঙ্গে শিশুকেও প্রথম থেকেই শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। আর এই দায়িত্ব প্রাথমিক ভাবে মা হিসেবে আপনাকেই নিতে হবে। ছোট থেকেই গুড টাচ-ব্যাড টাচের পার্থক্য শিশুকে বুঝিয়ে দিন। শিক্ষাটা শুরু হোক বাড়ি থেকেই।

শিশুর আস্থা তৈরি করুন
সবার আগে শিশুর আস্থা অর্জন করুন। আপনি হয়ে উঠুন তার ভরসার জায়গা। যাতে সে যেকোনো ভালোলাগা বা মন্দলাগার কথা আপনার কাছে নির্ভয়ে বলতে পারে। শিশুকে বোঝান, তার বিশ্বাসের জায়গা তৈরি করুন। তাকে গুড টাচ বা ব্যাড টাচ বোঝানোর আগে তার আস্থা অর্জন করা জরুরি।

ব্যাড টাচ সহজভাবে বোঝান
শিশুরা সরল। তারা গম্ভীর আলোচনা বুঝতে পারে না। তাই শিশুকে ব্যাড টাচ সম্পর্কে বলতে গিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করার দরকার নেই। তাহলে সে ভয় পেয়ে যেতে পারে। এটি নিয়ে আলাদা আলোচনায় বসারও দরকার নেই। প্রতিদিনের ছোট ছোট আলাপের মাঝেই বুঝিয়ে বলতে পারেন।

শরীরের সব অঙ্গ পরিচিত করুন
শিশুকে অবশ্যই তার প্রাইভেট পার্ট সম্পর্কে সচেতন করা প্রয়োজন। অভিভাবক হিসেবে কাজটি করতে হবে আপনাকে। তার প্রাইভেট পার্টে স্পর্শ করে কখনো আদর করবেন না। তাকে যে কেউ প্রাইভেট পার্টে হাত দিতে পারবে না শিশুর বয়স পাঁচ বছর হলে সেকথাও বুঝিয়ে বলুন।

অনুমতি নিন
সে শিশু হলেও তার থেকে অনুমতি নেওয়ার অভ্যাস করুন। এতে সে অনুমতির গুরুত্ব শিখবে। গোসল কিংবা পোশাক পরিবর্তন করানোর সময় অবশ্যই তাকে স্পর্শ করার আগে অবশ্যই তার অনুমতি নিন। এতে সে অনুমতি ছাড়া যে প্রাইভেট পার্টে হাত দেওয়া যায় না এটি বুঝতে শিখবে।

চিৎকার করতে শেখান
যেকোনো নেতিবাচক বা খারাপ আচরণ পেলে তাকে চিৎকার করতে শেখান। কারও স্পর্শ ভালো না লাগলে যেন সে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু করে।

হতে পারে তা যে কারও স্পর্শ। যেকোনো পরিস্থিতিতে তাকে নিজেকে রক্ষা করার বুদ্ধি শেখাতে হবে। তবে খেয়াল রাখবেন, এসব শেখাতে গিয়ে যেন শিশুর মনের ওপর বাড়তি চাপ না পড়ে।

সূত্র: ইত্তেফাক

বন্যা পরবর্তী সময়ের প্রস্তুতি

আকস্মিক বন্যায় তলিয়ে গেছে দেশের ১১ থেকে ১৩টি জেলা। বন্যা-কালীন সময়ে ত্রাণ ও দুর্গতদের সাহায্য গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু বন্যা পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসন ও কিছু করণীয় থাকে।

আভাস পেলে যা করবেন
আকস্মিক বন্যার শঙ্কা অনেক বেড়েছে। তাই বন্যার আভাস পেলে মুড়ি, চিড়া, গুড়, চিনি বা শুকনো জাতীয় খাবার সংরক্ষণ করা ভালো। বিশেষ করে বিশুদ্ধ খাবার পানি সংরক্ষণের জন্য চৌবাচ্চার ব্যবস্থা করা ভালো। এছাড়া সহজে বহনযোগ্য চুলা ও রান্না করার জন্য শুকনো জ্বালানির ব্যবস্থা রাখতে পারেন। বাড়ির বৃদ্ধ, শিশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী বিশেষ করে অন্তঃসত্ত্বা নারীর দিকে বিশেষ নজর রাখুন। এছাড়া টাকা, জমির দলিল, শিক্ষা সনদসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিরাপদে রাখুন। পানিবাহিত বিভিন্ন রোগের ওষুধ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সংরক্ষণে রাখুন। বন্যা পরবর্তী সময়ে বন্যার পানিতে হাঁটবেন না, সাঁতার কাটবেন না বা গাড়ি চালাবেন না। কারণ ৬ ইঞ্চি পানির স্তরেও আপনি নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারেন।

ডায়রিয়া হলে করণীয়
বন্যার সময় ডায়রিয়া বেশি দেখা দেয়। ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়। লবণ ও পানির অভাব পূরণ করাই এর একমাত্র চিকিৎসা। শরীর থেকে যে পরিমাণ পানি বেরিয়ে যায়, তা যদি দ্রুত ফিরিয়ে আনা সম্ভব না হয়, মানুষ তখনই অসুস্থ হয়ে পড়েন ও শরীরে লবণ পানির ঘাটতি দেখা দিলে মৃত্যু হওয়ারও আশঙ্কা থাকে।

বন্যার সময় চর্ম রোগ
বন্যার পানি গোসল বা গায়ে লাগানো থেকে বিরত থাকুন। কেননা এ

পানি বিভিন্ন জীবাণুর ধারক ও বাহক। তাই এ পানির সংস্পর্শে বিভিন্ন চর্ম রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। সব সময় পানির সংস্পর্শে থাকার জন্য হাতে-পায়ে স্যাঁতসেঁতে ও ভেজা আবহাওয়ার কারণে ত্বক বা ত্বকের খোসপাঁচড়া, ফাঙ্গাল ইনফেকশন, প্যারনাইকিয়া, স্ক্যাবিস জাতীয় নানা ধরনের ত্বকের অসুখ হয়ে থাকে।

বন্যায় টিউবওয়েল ডুবে গেলে করণীয়
যেসব টিউবওয়েল বন্যায় ডুবে গেছে, সেগুলোর পানি ডিসইনফেকশন না করে পান করবেন না। নিজেরাই করতে পারেন এ কাজ। ১০০ গ্রাম ব্লিচিং পাউডারের সঙ্গে দেড় থেকে দুই লিটার পরিমাণ পানি একটি জগ বা পাত্রে ভালো করে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করুন। এরপর টিউবওয়েলের মূল অংশটি পাইপ থেকে খুলে পাইপের মধ্যে সেই মিশ্রণটি ঢেলে দিন। এরপর ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। টিউবওয়েলের মূল অংশটি লাগিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট, প্রয়োজনে আরও বেশি সময় ধরে হাতল চাপতে থাকুন।

বাড়ি ফিরলে বা পুনর্বাসনে
অনুমতি দিলেই বা নিরাপদ বলার পরেই বাড়ি ফিরবেন। একটি সারভাইভাল কিট প্যাক করুন। সেখানে কমপক্ষে তিন দিনের জন্য পর্যাপ্ত খাবার ও পানি নিন। প্রত্যেকের জন্য একটি করে পোশাক, প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখুন। জরুরি তথ্যের জন্য রেডিও, স্থানীয় পরিবর্তনকারী সিস্টেম বা সরকারী নির্দেশাবলী শুনুন। বাড়িতে ঢোকার আগে দেখে নিন কোনো কাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে কি না। বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র পরিদর্শন করার আগে পাওয়ার চালু করবেন না। সাপ ও বিভিন্ন প্রাণী আপনার বাড়িতে থাকতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। সম্ভব হলে গ্লাভস ও বুট পরুন। বন্যা-দূষিত প্রতিটি ঘর পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত ও শুকিয়ে নিন।

সূত্র: ইত্তেফাক

সন্তানের একমাত্র আয়নায়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গবেষণায় বলা হয়েছে, যেসব শিশু তাদের গ্রান্ডপ্যারেন্টের সঙ্গে থেকেছে, তাদের ওপর ‘টক্সিক প্যারেন্টিং’ ও মা-বাবার নেতিবাচক সম্পর্কের প্রভাব কম। সেসব তাদের মানসিক বিকাশে খুব কমই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অভিভাবকের শাসন আদর সন্তানদেরকে লালন-পালন করা কেমন হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে অভিভাবকের মানসিক চিন্তা-ভাবনার ওপর। একজন সন্তানকে শান্তিপূর্ণভাবে বাড়িয়ে তুলতে হলে তার সাথে সেরূপ আচরণ করতে হবে এবং একজন সন্তানের ভবিষ্যৎ সুন্দর হওয়ার জন্য তার মা- বাবার শান্তিপূর্ণ আচরণই যথেষ্ট। একটা সুন্দর পরিবার, একজন অভিভাবকই পারেন সন্তানের জীবনে একটি স্বচ্ছ আয়নার ভূমিকা পালন করতে।

সূত্র: ইত্তেফাক

বন্যায় খাবার পানি বিশুদ্ধকরণ

ভয়াবহ বন্যাকবলিত এলাকায় বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান, জ্বালানি, ব্যাকটেরিয়ার মত দূষকগুলো বন্যার পানির সঙ্গে খুব বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে খাবার পানি অনেকদিন পর্যন্ত বন্যার দূষিত পানিতে পূর্ণ থাকে। তাই এই সময়টিতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবার পানি পরিশোধিত করার বিষয়টি আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

এক্ষেত্রে খাবার পানির বিশুদ্ধকরণের কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানিয়েছেন ফার্মাসিস্ট সাদিয়া সিদ্দিকী। চলুন জেনে নেই-

১. পানি ফুটানো-

পানি ফুটালে এতে থাকা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবীসহ রোগ-সৃষ্টিকারী জীবাণু মরে যায়। এই পানি সিদ্ধ করার কাজটি বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে।

পানি ফুটতে শুরু করলে, প্রথমে একটি পরিষ্কার কাপড়, কাগজের তোয়ালে বা কফি ফিল্টার দিয়ে ছেকে নিতে হবে এবং ফুটন্ত পানিকে স্থির হতে দিতে হবে। এভাবে পাওয়া পরিষ্কার পানিকে এক মিনিটের

জন্য আবার ফুটিয়ে নিতে হবে। ফুটন্ত বিশুদ্ধ পানি ঠান্ডা হওয়ার পর আঁটসাঁট কভারসহ পরিষ্কার স্যানিটাইজড পাত্রে তা সংরক্ষণ করতে হবে।

সিদ্ধ পানির স্বাদ ভালো করার জন্য এটি এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢেলে কয়েক ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে। এছাড়া প্রতি লিটার সিদ্ধ পানিতে এক চিমটি লবণ যোগ করেও স্বাদ উন্নত করা যায়।

২. রাসায়নিক জীবাণুনাশক ব্যবহার-

পানি ফুটানো সম্ভব না হলে রাসায়নিক জীবাণুনাশক যেমন গন্ধহীন ক্লোরিন ব্লিচ, আয়োডিন বা ক্লোরিন ডাই অক্সাইড ট্যাবলেট ব্যবহার করে অল্প পরিমাণ পানি পান করার জন্য নিরাপদ করতে পারেন। এগুলো বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায় এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে পানি চিকিৎসা করার জন্য তৈরি করা হয়ে থাকে।

জীবাণুনাশকগুলো বেশির ভাগ ক্ষতিকারক বা রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম ও গিয়ার্ডিয়ার মতো আরও প্রতিরোধী জীবাণু মারার জন্য এই পদ্ধতি কার্যকর নয়। এর জন্য পানি ফুটাতে হবে।

তবে ক্লোরিন ডাই অক্সাইড ট্যাবলেটগুলো ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু এর জন্য ট্যাবলেটের লেবেল বা প্যাকেজে থাকা প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

পানিতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক বা তেজস্ক্রিয় উপাদান থাকলে সেখানে একটি জীবাণুনাশক যোগ করলেই তা পানযোগ্য হবে না। আয়োডিন দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা পানি গর্ভবতী নারীদের, থাইরয়েড সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের বা আয়োডিনের প্রতি অতি সংবেদনশীলদের জন্য ক্ষতিকর। এটি ক্রমাগত ব্যবহারের করাও ঠিক নয়। একবারে সর্বোচ্চ কয়েক সপ্তাহ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩. ব্লিচ ব্যবহার-

ব্লিচের বিভিন্ন ঘনত্বের হয়ে থাকে। ব্লিচ দিয়ে পানি জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি শুরুর আগে এর ঘনত্ব জানতে হবে। আর এটি পাওয়া যাবে ব্লিচের লেবেলে। একেক দেশে ঘনত্ব একেক রকম হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ব্লিচে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইটের ঘনত্ব ৫ থেকে ৬

শতাংশ।

ব্লিচ দিয়ে জল জীবাণুমুক্ত করার জন্য প্রথমেই পানি ফুটিয়ে পরিষ্কার পানি আলাদা করে নিতে হবে।

সাধারণত খাবার পানি জীবাণুমুক্ত করার নির্দেশনা ব্লিচের লেবেলেই দেওয়া থাকে। তবে তা না থাকলে, লেবেলে উল্লেখিত ‘সক্রিয় উপাদান’থেকে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট শতাংশ নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে।

তারপর একদম অতি সামান্য পরিমাণে ব্লিচ চা-চামচে নিয়ে বিশুদ্ধ পানির প্রতি লিটারে যোগ করতে হবে। মিশ্রণটি ভালো করে নাড়াতে হবে। এরপর কমপক্ষে ৩০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। জীবাণুমুক্ত পানি পরিষ্কার ও স্যানিটাইজড পাত্রে শক্ত কভারসহ সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. ফিল্টার-এর মাধ্যমে পরিশোধন

কিছু পোর্টেবল ওয়াটার ফিল্টার আছে, যা খাবার পানি থেকে রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবী যেমন- ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম ও গিয়ার্ডিয়া দূর করতে পারে।

অধিকাংশ পোর্টেবল ওয়াটার ফিল্টার ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া অপসারণ করে না। তাই ফিল্টার নির্বাচনে বেশ সাবধানী হতে হবে। অধিক প্রতিরোধী পরজীবীগুলোকে অপসারণ করার জন্য ফিল্টারের ছিদ্রের আকার যথেষ্ট ছোট হতে হবে।

আকারে যা প্রায় এক মাইক্রন বা তার থেকে ছোট। পানি ফিল্টারের সময় এর লেবেলে থাকা প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী সতর্কতার সঙ্গে পড়ে অনুসরণ করতে হবে।

ফিল্টার করার পরে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার ধ্বংস নিশ্চিত করতে ফিল্টার করা পানিতে আয়োডিন, ক্লোরিন বা ক্লোরিন ডাই অক্সাইডের মতো জীবাণুনাশক যোগ করা যেতে পারে।

৫. পাতন প্রক্রিয়া-

পানিতে থাকা অন্যান্য দূষিত এবং রোগ সৃষ্টিকারী উপাদানের তুলনায় পানি অল্প তাপেই ফুটতে শুরু করে।

এ পদ্ধতিতে স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত পানিতে তাপ দিতে

হয়। তারপর এটি বাষ্পীভূত না হওয়া পর্যন্ত ফুটন্ত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। এই বাষ্প ঠান্ডা করার জন্য একটি কনডেন্সার ব্যবহার করা হয়। শীতল হওয়ার পরে বাষ্প পরিষ্কার এবং নিরাপদ পানযোগ্য পানিতে পরিণত হয়। উচ্চতর স্ফুটনাঙ্কযুক্ত অন্যান্য পদার্থগুলো পাত্রে পলি হিসেবে রেখে দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতি ব্যাকটেরিয়া, জীবাণু, লবণ এবং অন্যান্য ভারী ধাতু যেমন সীসা, পারদ এবং আর্সেনিক দূর করতে কার্যকর। পাতন কাঁচা ও অপরিশোধিত পানির জন্য আদর্শ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধা উভয়ই রয়েছে। একটি উল্লেখযোগ্য অসুবিধা হল এটি পানি বিশুদ্ধকরণের সব থেকে ধীর প্রক্রিয়া।

তবে এই পরিশোধন কাজটি করার জন্য একটি তাপীয় উৎস প্রয়োজন। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সস্তা তাপীয় উৎস তৈরি হলেও পাতনের মাধ্যমে পানি বিশুদ্ধ করা এখনো ব্যয়বহুল প্রক্রিয়াই রয়ে গেছে। এটি অল্প পরিমাণে পানি বিশুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী। বড় আকারের, বাণিজ্যিক বা শিল্প পর্যায়ে পানি পরিশোধনের জন্য এই পদ্ধতি আদর্শ নয়।

সূত্র: ইত্তেফাক

পাকা চুল নিয়ে যত ভুল ধারণা

অনেকে ভাবেন পাকা চুল তুললে চুল আরও পাকতে শুরু করে। এমনটি সঠিক ধারণা নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চুল পাকবে, এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ৩০ বছর বয়সের পর থেকে প্রতি দশকে মোটামুটিভাবে ১০ থেকে ২০ শতাংশ করে চুল পাকতে থাকে।

গবেষণায় দেখা গেছে, পঞ্চাশ বছর বয়স হলে ৫০ শতাংশ চুল পেকে যায়। আমাদের মধ্যে এক ধরনের ধারণা আছে যে পাকা চুল টেনে চুললে আরও পাকা চুল গজায়। অনেকটা সংক্রামক ধরে নেয়। এটা এক ধরনের কুসংস্কার ও ভুল ধারণা।

সুইডেনের স্টকহোমের চুলের সৌন্দর্যচর্চাকেন্দ্র সাচাহুয়ানয়ের

ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর অব এডুকেশন ও হেয়ার স্টাইলিস্ট ট্রে গিলিয়েন জানান, নির্দিষ্ট কোনো চুলের গোড়ায় থাকা ফলিকলের মধ্যকার পিগমেন্ট কোষগুলো যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন চুল সাদা হওয়ার সুযোগ নেই। তবে চুলের গিপমেন্ট কোষ মারা গেলে তার পাশের চুলের কোষে এর কোনো প্রভাব পড়ে না।

তাহলে ক্ষতি হয় কেন
পাকা চুল বার বার টেনে তোলার কিছু ক্ষতিকর দিক আছে। একটি চুলের ফলিকল থেকে একটাই চুল গজানো সম্ভব। আর যে চুলটি একবার সাদা হয়ে গেছে, তার মানে হল ওই চুলের ফলিকলের পিগমেন্ট কোষ ইতিমধ্যেই মারা গেছে। সেটা টেনে তুলে ফেললে সেখানে আবার সাদা চুলই গজাবে। তাছাড়া বারবার পাকা চুল টেনে তোলার কারণে ওই ফলিকলটি ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। একপর্যায়ে সেই ফলিকল থেকে চুল গজানোই বন্ধ হয়ে যাবে।

পাকা চুল থাকা ভালো
এজন্যই অনেকে বলেন একেবারে না থাকার তুলনায় পাকা চুল নিঃসন্দেহে ভালো। এ ছাড়াও চুল টেনে তোলার কারণে ওই স্থানে প্রদাহ দেখা দিতে পারে, দাগ হয়ে যেতে পারে, চুল পাতলা হওয়া শুরু হওয়াও সম্ভব, নিয়মিত পাকা চুল তুললে সংক্রমিত ত্বকে হাইপারপিগমেন্টেশন দেখা দিতে পারে। ফলিকল নষ্ট হয়ে চুলের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। মাথার নির্দিষ্ট অংশ থেকে ক্রমাগত চুল তুলে গেলে দেখা দিতে পারে ট্রিকোটিলোম্যানিয়া৷ তার থেকে দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারে চুল পড়ার সমস্যা।

সূত্র: ইত্তেফাক

কর্মক্ষেত্রে জেন-জি’রা যেমন

নব্বই দশকের শেষভাগ থেকে ২০১০ এর দশকের প্রথম দিকের যারা তাদের বলা হয় জেনারেশন জেড বা জেন-জি। এই প্রজন্মের তরুণদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। এর আগের প্রজন্ম অর্থাৎ মিলেনিয়ালদের মধ্যে পূর্বসূরিদের কিছু প্রথাগত বৈশিষ্ট্য রয়েই গেছে। কিন্তু মিলেনিয়াল আর জেন জির মধ্যে বৈশিষ্ট্যে তো মিল নেই-ই, বরং

ব্যবধান অনেক বেশি।

কর্মক্ষেত্রগুলোয় ইতোমধ্যে প্রবেশ করেছে এই প্রজন্মের তরুণরা, সময়ের সঙ্গে যে অংশগ্রহণ আরও বাড়বে। জেন-জির অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে এখন থেকেই তাই কর্মক্ষেত্রগুলোর উচিত এই প্রজন্ম সম্পর্কে জানাশোনা বাড়ানো, তাদের বোঝার চেষ্টা করা। জেনজিকে কর্মক্ষেত্রে স্বাগত জানানোর এই চর্চাটিকেই গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

টেক-স্যাভি বা দারুণ প্রযুক্তি-বান্ধব:
সবচেয়ে প্রযুক্তি-বান্ধব প্রজন্ম হিসেবে তারা খুব সহজেই বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং এই দক্ষতা খুব সহজেই কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে।

কাজের ধরণ:
জেন-জি যেন কঠোর নিয়মানুবর্তিতার উল্টোদিকে হাঁটে। বরং তাদের পছন্দ তুলনামূলক নমনীয়-সহনীয় কাজের পরিবেশ। তারা এমন পদ্ধতিতে কাজ করতে ভালোবাসে যেখানে তাদের সক্ষমতা ও দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা যায় এবং তারা যেন তাদের সেরাটা সেখানে দিতে পারে।

কাজের পরিবেশ যেমন হবে:
জেন-জির তরুণরা কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পছন্দ করে। সে কারণেই দৈনন্দিন রুটিনে নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়। তারা চায় কাজের পরিবেশ হবে নমনীয়। তার ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত যাতে না করে। জীবন সম্পর্কে শিথিল দৃষ্টিভঙ্গি দেখে হতবাক হলে হবে না। জেন-জির তরুণরা অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং যেখানেই থাকুক না কেন তারা সেখানে একটি ইতিবাচক আবহ তৈরি করে নিতে সবসময় প্রস্তুত। পাশাপাশি তারা সবসময় নতুন কিছু শিখতে চায়, দক্ষতা বাড়াতে চায়, এমন সুযোগ চায় যেখানে তারা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

যোগাযোগ বাড়াতে:
প্রথাগত যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন ইমেইল বা টেলিফোনের চেয়ে জেন-জির পছন্দ ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং অ্যাপসহ ডিজিটাল যোগাযোগের অন্যান্য পদ্ধতি। এটাও প্রযুক্তির সঙ্গে তাদের সম্পর্কেরই বহিঃপ্রকাশ। স্ল্যাক, মাইক্রোসফট টিমস ও হোয়াটসঅ্যাপের মতো প্ল্যাটফর্মগুলোতে খুব সহজেই তারা সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করতে পারে।

ব্যবধান কমাবেন যেভাবে:
জীবন সম্পর্কে জেন-জির যে অনন্য ধারণা আছে, তা হয়তো কর্মক্ষেত্রে কিছুটা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। পরিবর্তন করতে গেলে কিছু বাধা আসবেই, আবার কর্মক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখেও তাদের পড়তে হতে পারে। জেনজির সঙ্গে যোগাযোগের দূরত্ব পূরণে কর্মক্ষেত্রেই সেতুবন্ধন তৈরি করতে হবে। দুই পক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, এমন কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর হতে পারে উদার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে জেন-জিকে নির্বিঘ্নে মিশে যাওয়ার সুযোগ দিতে হলে সেখানে অন্তর্ভুক্তির সংস্কৃতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে সুযোগ দেওয়ার বিষয়ে উদার হতে হবে, এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে যেকোনো বয়সের মানুষের কাজকে মূল্যায়ন করা হবে, যোগ্যতার স্বীকৃতি দিতে হবে, কাজের প্রশংসা করতে হবে।

দলগত কাজ করার প্রক্রিয়া:
বিভিন্ন টিম-বিল্ডিং অ্যাকটিভিটি বা দলগতভাবে করা যায় এমন কাজের ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে বয়স্ক ও তরুণরা একসঙ্গে মিলে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করবেন। এজন্য কর্মশালা বা কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নের আয়োজন করা যেতে পারে। এর ফলে কেবল যে তাদের প্রজন্মের বাইরে গিয়ে দলগত কাজ করার সুযোগ তৈরি হবে তা-ই নয়, বরং স্টেরিওটাইপ বা কারও সম্পর্কে কাঠামোবদ্ধ ধারণা ভেঙে দেবে এবং সহানুভূতি তৈরি করবে। কর্মক্ষেত্রগুলো যত বিকশিত হবে, যত গতিশীল হয়ে উঠবে, প্রতিষ্ঠানকে তত বেশি পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে শিখতে হবে। যদি ইতিহাস থেকে আমরা কিছু শিখে থাকি, তাহলে প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই উন্নয়নের জন্য জেন-জির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ হলো জেন-জি, তাই আমাদের এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেন তারা কাজের ক্ষেত্রে যথাযথ সুবিধা পায় এবং কর্মক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে।

সূত্র: ইত্তেফাক